Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-I, October 2023, Page No.114-128
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

শান্তা দেবী-সীতা দেবীর সাহিত্য: নতুন নারীর নির্মাণ

রাহুল বর

গবেষক, পিএইচ. ডি, বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়,ভারত

Abstract:

Shanta Devi and Sita Devi, the two daughters of Ramananda Chattopadhyay, started a new direction in literary world. They grew up in the liberal, progressive, cultured environment of the Brahmo family. The varied life experiences of the highly educated Shanta Devi and Sita Devi, depicted in their literature, have come from growing up in this cultural milieu. Their writings include stories, novels, poems, memoirs, biographies, travelogues, translated literature, juvenile literature etc. Struggle for self-establishment, efforts to earn a living, joint participation of men and women in social service work, demand for individual independence, freedom of association and exchange of ideas between men and women, demand for equal power, right to choose a life partner, above all, the rearrangement of the eternal relationship between men and women have emerged. Apart from father Ramananda, mother Manorama Devi, vicinity of Rabindranath helped them to shape their mentality and develop their literary career. Women's progressive thoughts are also acquired from them. Therefore, most of their writings talk about the individuality of women, giving the message of enlightening the girls of the inner cities to overcome the obstacles and get enlightened in the light of education. However, apart from feminist literature, they have shown mastery in writing literature from other perspectives. Through the analysis, evaluation and review of the literature created by Shanta Devi-Sita Devi, their role in creating new women and their place in the literary world is discussed in this article.

Key words: Shanta Devi-Sita Devi, twentieth century, gender equality, feminist literature, modernism.

মূল প্রবন্ধ: উনিশ শতকের বাংলায় আধুনিক শিক্ষার প্রসারের ফলে সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতিতে এক নতুন ভাবনা-চিন্তার আভাস পরিলক্ষিত হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলীন্য প্রথা প্রভৃতি কুপ্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার পাশাপাশি নারী মুক্তি, নারী শিক্ষা, নারী প্রগতির পক্ষে দাবি জানান। এই সমাজ সংস্কার আন্দোলন-এর প্রভাবে নারীরা অন্তরাল থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হচ্ছিলেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নারীশিক্ষা মোটামুটিভাবে সমাজ স্বীকৃত হয়, যা প্রগতির পথে নারীকে এগিয়ে দিয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটে বাংলা সাহিত্যে মহিলা সাহিত্যিকদের আবির্ভাব। তাঁরা সাহিত্যের মাধ্যমে তাঁদের মনোভাব ব্যক্ত করা শুরু করলেন এই সময় থেকে। তাঁদের লেখায় পরিলক্ষিত

হয় সমকালীন সমাজের নানা কুপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, অন্যান্য নানা প্রসঙ্গ; যা, বিশ শতকে এসে আরও বিস্তৃতি লাভ করে। এমনই এক প্রেক্ষাপটে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-এর দুই কন্যা শান্তা দেবী (১৮৯৩-১৯৮৪) ও সীতা দেবী (১৮৯৫-১৯৭৪)-র সাহিত্য জগতে আত্মপ্রকাশ। কলকাতায় জন্মগ্রহণ করলেও বাবার চাকরি সূত্রে খুব ছোটবেলাতেই তাঁদের এলাহাবাদে চলে যেতে হয়। রামানন্দের পৈত্রিক বাড়ি বাঁকুড়াতে হওয়ায় প্রতিবছর গ্রীষ্মের ছুটিতে সেখানে যাওয়ার সূত্রে শান্তা দেবী-সীতা দেবীর বাংলার সংস্কৃতি, আচার-অনুষ্ঠানের সাথে পরিচয় ঘটে। মাঘোৎসবে কলকাতা গমনও ঘটত। পরবর্তীকালে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মস্থান কলকাতায় পাকাপাকিভাবে ফিরে আসা। এইভাবে উক্ত তিনটি স্থানের প্রভাব তাঁদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। ব্রাহ্ম পরিবারের উদার, প্রগতিশীল, সংস্কৃতিমনস্ক পরিবেশে তাঁদের বড় হয়ে ওঠা। রামানন্দ নিজে ছিলেন নারী প্রগতির সমর্থক। সমাজে নারীরা ব্রাত্য, উপেক্ষিত হয়ে থাকুক, এটা তিনি চাইতেন না। সীতা দেবীর জন্ম সংবাদ শ্রবণে তাঁর মেজ জ্যাঠামশাই দুঃখ প্রকাশ করাতে রামানন্দ ক্ষুব্ধ হয়ে জানান, "মেজদাদাকে কি আমার মেয়েকে খাওয়াতে হবে যে তিনি দুঃখিত হতে গেলেন?"[১] নারী সম্বন্ধে রামানন্দের এই প্রগতিশীল, উদারচেতা ভাবনা; এই আধুনিক মনন তাঁর সন্তানদের মধ্যেও সঞ্চারণ ঘটে। প্রথমে বেথুন স্কুল ও পরে বেথুন কলেজে শান্তা দেবী-সীতা দেবীর শিক্ষালাভ ঘটে। তাঁদের বিবাহের বয়স যথাক্রমে বত্রিশ ও আঠাশ, যা সমকালীন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে দুর্লভ ঘটনা তো বটেই, আজকের দিনেও বিরল।

ছোটবেলা থেকেই 'প্রদীপ', 'প্রবাসী', 'হিতবাদী', 'বঙ্গবাসী', 'সঞ্জীবনী', 'বামাবোধিনী'-র মতো পত্রিকা ছাড়াও 'আখ্যানমঞ্জরী', 'চারুপাঠ', 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধে বিচার', 'Royal Readers', 'Ivanhoe', 'Talisman'-এর মতো গ্রন্থের সাথে পরিচয় ঘটে তাঁদের। মা মনোরমা দেবীর কাছে শুনতেন 'রামায়ণ', 'মহাভারত'-এর নানা কাহিনি, নেপাল চন্দ্র রায় শোনাতেন 'জিন ভ্যাল জিন', 'দি কাউন্ট অব মন্টিক্রিস্টো', 'থ্রি মাস্কেটিয়ার্স', 'দি কোরাল আইল্যান্ড'-এর গল্প, যা তাঁদের সাহিত্য জীবনের সূত্রপাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

> "নানারকম গল্প শুনে শুনে ছোটবেলায় থেকেই গল্প বলার একটা ইচ্ছা আমাদের দুই বোনের মধ্যে জেগেছিল। মনে মনে নানা গল্প রচনা করে আমরা দু-জন পরস্পরকে বলতাম।"[২]

পিতার রামানন্দ, মা মনোরমা দেবী ছাড়াও রবীন্দ্রসান্নিধ্য তাঁদের মানসিকতা গঠনের পাশাপাশি, সাহিত্য জীবনের বিকাশে সাহায্য করেছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেই শান্তা দেবীকে নারীবাদের চর্চায় উৎসাহিত করেছিলেন। এঁরা ছাড়াও শান্তা দেবী-সীতা দেবী আরও বেশ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির সাহচর্য লাভ করেছিলেন সেই ছোটবেলা থেকেই। এলাহাবাদে থাকতেই তাঁদের সাথে পরিচয় ঘটেছিল অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তেজ বাহাদুর সাপ্রু, নগেন্দ্রনাথ সোম, মেজর বামন দাস বসু, কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখের সাথে। সেই বয়সেই তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন 'বঙ্গভঙ্গ'-কে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হওয়া স্বদেশী, বয়কট এবং রাখিবন্ধন অনুষ্ঠানও।

> "...এল বঙ্গভঙ্গ। বাংলাদেশে তখন সভাসমিতি, পুলিশের গুঁতো, ধরপাকড়, বিলিতি কাপড় পোড়ান, স্বদেশি কাপড় ফিরি করা, কতরকম উত্তেজনা। আমরা বাইরে থাকলেও একেবারে নীরব ছিলাম না। এলাহাবাদেও সভা, মিছিল, রাখীবন্ধন সব হত।"[৩]

রাখিবন্ধনের দিন রামানন্দের পরিবারে অরন্ধন পালিত হত। রামানন্দ তাঁর পরিচিতদের ডাকযোগে রাখি পাঠাতেন। শান্তা-সীতাও ঘরের মধ্যে স্থির থাকতে পারতেন না। এই উপলক্ষ্যে হওয়া মিছিল, সভা-সমিতিতে অংশগ্রহণ করতেন তাঁরা। এ বিষয়েও রামানন্দ ছিলেন প্রগতিশীল। রাজনীতিতে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণকে তিনি সর্বদাই আহ্বান ও সমর্থন জানিয়ে এসেছেন। তাই ১৯০৫-এর কাশি কংগ্রেস অধিবেশন এবং বেনারস ক্যান্টনমেন্টে একেশ্বরবাদীদের সভাতে শান্তা দেবী-সীতা দেবীর যোগদানে কোনওরূপ বাধার সৃষ্টি হয়নি। বিশ শতকের শূণ্য দশকে, যেখানে সমাজ থেকে রক্ষণশীলতার পর্দা উন্মোচিত হওয়ার পথ তখনও সুগম নয়, সেই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে রামানন্দের এই প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনা তাঁদের আধুনিকতার পথে আরও বেশি এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। তবু, গুরুজনদের এত বেশি প্রভাব থাকলেও, শান্তা দেবী-সীতা দেবী কখনও তাঁদের স্বকীয়তা হারাননি-সেটা ব্যক্তি জীবনে হোক বা সাহিত্য জীবনে।

উপরিউক্ত নানা কারণে সাহিত্য জগতে শান্তা দেবী-সীতা দেবী একটি নতুন দিক উন্মোচনে সক্ষম হয়েছিলেন। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত শান্তা দেবী-সীতা দেবীর রচনায় যে বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতার ছবি ফুটে উঠেছে, তার উপাদান এসেছে এই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠার মধ্যে থেকেই। তাঁদের পূর্বসূরীদের কথা বলতে গেলে আমরা বলতে পারি নিরুপমা ও অনুরূপা দেবী যে সাহিত্যধারার সৃষ্টি করেছিলেন, অন্যান্য নারী সাহিত্যিকরা সেই ধারার অনুসরণ করেছিলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের সাহিত্যের বিষয় ছিল নারীর সতীত্ব রক্ষা। সেখানে নারীকে দেখা হয়েছে পুরুষ শাসিত সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে-আদর্শ স্ত্রী, গৃহিনী, মাতা রূপেই নারীর পরিপূর্ণ বিকাশ। এই সমস্ত সাহিত্যে দেখানো হয়েছে পাশ্চাত্য অভিঘাতে ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে হিন্দুধর্ম কলুষিত হচ্ছে, তাই তা টিকিয়ে রাখা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ব্যাতিক্রমী ধারা শান্তা দেবী-সীতা দেবী যৌথভাবে শুরু করেন। এপ্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত প্রণীধানযোগ্য-

> "স্বর্ণকুমারী দেবীর পরবর্তী মহিলা-ঔপন্যাসিকের হাতে উপন্যাস সাধারণতঃ দুইটি বিপরীতমুখী ধারার অনুবর্তন করিয়াছে। এক শ্রেণীর লেখিকা হিন্দু-সমাজের উপর আক্রমণ ও সমালোচনার প্রতিক্রিয়ারূপে ইহার সনাতন বিধি-নিষেধ ও মূলীভূত আদর্শের পক্ষসমর্থনের কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এই শ্রেণীর প্রধান প্রতিনিধি নিরুপমা দেবী ও অনুরূপা দেবী।...দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধির মধ্যে সীতা ও শান্তা দেবীর নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ইহাদের উপন্যাসে বিশেষ করিয়া নারী-সমাজে আধুনিক মনোবৃত্তির প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষাসংস্কারের নানামুখী আলোড়ন নারীহৃদয়ে কিরূপ প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি করিয়াছে, নারীর ভাবগভীরতার মধ্যে এই পরিবর্তনের তরঙ্গ-চাঞ্চল্য কতখানি স্থির-সংহত হইয়াছে-এই কাহিনীর ইতিহাসই ইহাদের উপন্যাসের প্রধান বিষয়।"[৪]

শান্তা দেবী-সীতা দেবীর অধিকাংশ রচনাই প্রবাসীতে প্রকাশিত। যদিও, 'The Mordern Review', 'কল্লোল', 'বঙ্গলক্ষ্মী', 'দাসী', 'জয়শ্রী', 'মুকুল'-এর মতো বেশ কিছু স্বনামধন্য পত্রিকাতে তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্য স্থান করে নিয়েছে। তাঁদের লেখালেখির মধ্যে আছে গল্প, উপন্যাস, কবিতা, স্মৃতিকথা, জীবনী, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, অনুবাদ সাহিত্য, শিশু-কিশোর উপযোগী গল্প প্রভৃতি। পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক অধিকাংশ মহিলা ঔপন্যাসিক তাঁদের সমাজ সমস্যামূলক রচনায় সমাজের অসংগতির স্বরূপ রূপায়ণকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে উপন্যাসের চরিত্রের ব্যক্তি 'আমি'-কে উপেক্ষা করে গেছেন। সেখানে নারীর নিজের কথা অনেকাংশেই অব্যক্ত থেকে গেছে। এক্ষেত্রে ব্যাতিক্রমী দৃষ্টান্ত শান্তা দেবী-সীতা দেবী। তাঁদের সাহিত্যের বিষয়বস্তু, ভাষা ও জীবন সম্বন্ধে আলোচনার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট। ফুটে উঠেছে আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির

সংগ্রাম, জীবিকার্জনের চেষ্টা, সমাজ সেবামূলক কর্মে পুরুষ-নারীর একত্রে অংশগ্রহণ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দাবি, নারী-পুরুষের মেলামেশা ও মতের বিনিময়ের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা, সমান ক্ষমতার দাবি, জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার স্বাধিকার, সর্বোপরি নারী-পুরুষের চিরন্তন সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কথিত 'সাহিত্যাকাশের যুগ্মতারা' হলেন এই শান্তা দেবী-সীতা দেবী। তাঁদের অধিকাংশ লেখাই নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা বলে, অন্তঃপুরবাসী মেয়েদের বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে শিক্ষার আলোকে আলোকিত হওয়ার বার্তা দেয়। অর্থাৎ, মেয়েদের অবস্থানগত অস্তিত্বের সংকট এবং তা থেকে উত্তরণের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। যদিও নারীকেন্দ্রিক সাহিত্য ছাড়াও অন্যান্য নানা দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্য রচনায়ও তাঁরা নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন।

১৩২৪ বঙ্গাব্দে 'প্রবাসী'-র ভাদ্র সংখ্যায় শান্তা দেবীর প্রথম মৌলিক গল্প 'সুনন্দা' (প্রবাসী, ভাদ্র ১৩২৪) প্রকাশিত হয়। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পটির মধ্যে 'কবিত্বপূর্ণ উচ্ছ্বাসেরই প্রাধান্য' খুঁজে পেয়েছেন। অবশ্য কাঁচা হাতে লেখা এই গল্পে সেই অতিকাব্যিকতাকে বাদ দিলে সমাজের এক রূঢ় বাস্তব চিত্রই প্রত্যক্ষ করি আমরা। সুনন্দা পিতৃপরিচয়হীন এক পতিতা কন্যা। তার সাথে শংকরপ্রসাদের সম্পর্ক বৈধতা পায় না। শংকরপ্রসাদের পিতামহর সংলাপ থেকেই সমাজ সংকটের স্পষ্ট ছবি ফুটে ওঠে। সুনন্দাকে তিনি বলেন, "...মানুষের মাটির শরীর কিনা; একটু ছোঁয়া লাগলেই কালী হয়ে যায়। ...গঙ্গা জলের মত তুই নির্ম্মল। কিন্তু মানুষের সমাজে তাতে যে কিছু হয় না ভাই। মানুষ তার মাটির শরীর নিয়ে বড় ভয়ে ভয়ে বাঁচিয়ে চলে।"[৫] পরবর্তীকালে গল্পটি 'উষসী' (১৯১৮ খ্রি.) গল্প সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। ওই গল্পগ্রন্থের আরও একটি গল্প 'পিতৃদায়', যেখানে গল্পের মূল চরিত্র অলকা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের চাপিয়ে দেওয়া পতিসর্বস্বতার বিধানকে অস্বীকার করবার সাহস দেখিয়েছে। তার কঠোর ব্যক্তিত্ব ও আত্মসম্মানবোধ গল্পটিকে বিশিষ্টতা দান করেছে। অপরিমিত অর্থলোভের কারণে তৈরি পণপ্রথার কবলে পড়ে নিঃস্ব ত্রৈলোকনাথ, কন্যা অলকার বিয়ে দিতে পারছিলেন না। একদিন শুনলেন অরুণকুমার নামে এক নব্যপন্থী প্রগতিশীল যুবক বিনা পণে বিবাহ করার প্রতিজ্ঞা করে বসেছে। এই অরুণকুমারের সাথে অলকার বিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু গল্পের জটিলতা তৈরি হয় এর পর থেকেই। অরুণের বাবা তাকে জানান, বিয়ের কারণে ধার করা দু'হাজার টাকা শোধ না করা পর্যন্ত তার এই বাড়িতে কোনও স্থান নেই। যেহেতু দরিদ্রকে অন্ন দান তাদের বাড়ির সনাতন ধর্ম, আর পুত্রবধূ অলকা দরিদ্র ঘরের কন্যা, তাই তাকে আশ্রয়চ্যুত করা হবে না। এখানে উল্লেখ্য পুত্রবধূ হিসেবে স্ব-স্থান অধিকার করতে বলা নয়, দরিদ্র কন্যা হিসেবে তাকে আশ্রয় দিতে চাওয়া হয়েছে। স্বভাবতই আত্মমর্যাদাসম্পন্ন অলকার এ প্রস্তাব পছন্দ হয় না। সে নিজের বাড়িতে ফিরে যায়। অরুণ যায় ঋণ পরিশোধের লক্ষ্যে উপার্জনের চেষ্টায়। কিন্তু তা করতে গিয়ে সে অলকাকে উপেক্ষা করা শুরু করে। যে স্বামীর চিঠির প্রত্যাশা অলকার নিত্যদিনের সঙ্গী, দীর্ঘদিন ধরে সেই চিঠি না পেয়ে, ক্রমাগত অপমানিত হতে হতে শেষে তার মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। পরে যখন অরুণ অলকাকে তার বাড়িতে ফিরিয়ে নিতে চায়, তখন সে বেঁকে বসে। ফিরে যেতে অস্বীকার করে তার সাথে। কারণ ততদিনে সে অরুণের স্বরূপ ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিল। বড় বড় আন্দোলনের প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করা অরুণের বিপ্লবী ভাব আসলে তার বাইরের খোলস। তার বিনা পণে বিবাহ করাটাও কোনও আদর্শ দ্বারা পরিচালিত নয়, তা আসলে বাহবা পাওয়ার লোভ। 'দরিদ্রের অরক্ষণিয়া কন্যা' অলকাকে বিবাহ করা তার

কাছে 'কীর্তি স্থাপন করা', খবরের কাগজে জয়ধ্বনি পাওয়া। তাই তো, যখন তার বাবা তাকে গৃহত্যাগ করতে বাধ্য করে, তখন তার সংলাপে তার অন্তঃস্থিত কদর্য, হীন মানসিকতারই পরিচর্যা পায়।

"ভাবছিলাম অন্য কোথাও বিয়ে করলে আজ আমি পাঁচ-দশ হাজার টাকার মালিক হতাম, আর তোমাকে উদ্ধার করতে গিয়ে, দু হাজার টাকার ঋণ মাথায় তুললাম। আর সঙ্গে সঙ্গে বাড়িঘর সব হারালাম।"[৬]

অলকার প্রতিবাদী সত্ত্বাকে সে 'ভিখিরির মেয়ের তেজ' বলে ব্যঙ্গ করতেও ছাড়েনি। এই অরুণকে ত্যাগ করার মধ্যে দিয়ে, তার সাথে ফিরে যেতে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে অলকার আধুনিক আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নারীর প্রতিবাদী সত্ত্বারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

শান্তা দেবীর আরও একটি উল্লেখযোগ্য রচনা, 'পথের দেখা' (১৯৪৪) সংকলন গ্রন্থের নামগল্পটি। শান্তা দেবী নিজে ছিলেন ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ভুক্ত আধুনিক ধারণার অধিকারী। গল্পটির মূল চরিত্র অনসূয়াকে তেমনই দেখিয়েছেন। দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর স্তর অতিক্রম করার পরও তার জ্ঞানতৃষ্ণা মেটেনি। তাই সে ডাক্তার হওয়ার বাসনা নিয়ে দিল্লি চলেছে দূর সম্পর্কের পুরুষ সঙ্গীর সাথে। পথে সাক্ষাৎ হওয়া এক বিধবা রমণীর সাথে তার কথোপকথনের মাধ্যমে রক্ষণশীল পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাসের ছবিও ফুটিয়ে তুলেছেন কথাকার। এই সংকলনের আরও এক রচনা 'মানসী' গল্পেও শিক্ষিত আধুনিক মেয়ের স্বতন্ত্র ভাবনা-চিন্তার আভাস পরিলক্ষিত হয়। তার জীবনের সমস্ত ধরনের সিদ্ধান্ত সে নিজেই নেয়। এমনকি বিয়ের পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রেও তার সিদ্ধান্তই শেষ কথা। কেউ লোভী, কেউ নির্বুদ্ধি, কেউবা কুৎসিত, আবার কেউ হিসেবী, কেউ অভদ্র, তো দোজবরে কেউ, কেউ আবার ছোটলোক। এমনই নানা খুঁত দেখিয়ে তার কাছে আসা বিবাহের সমস্ত সম্বন্ধকে সে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। জ্যোতির্ময় নামের এক বিলেত ফেরত যুবক তাকে বিবাহের জন্য চোদ্দ হাজার টাকা পণ দাবি করেছে শুনে মানসী বলে, "শেষে জামাই কি টাকা দিয়ে কিনে আনছ? অমন যদি কর তবে আমি আর জলস্পর্শও করব না।"[৭] এই সংলাপ স্পষ্টতই শিক্ষিত মেয়ের আধুনিক চিন্তা-ভাবনা প্রসূত। শিক্ষা-দীক্ষার অহংকারেই সে হীরের আংটি পরিহিত জমিদার পুত্রের সাথে বিবাহের সম্বন্ধকে অস্বীকার করে।

"...অমন বোকা বোকা পয়সাওয়ালা মাড়োয়ারীর সঙ্গে আমার বিয়ে দিও না। আমি কিছুতেই করব না। এই জন্য কি আমায় এত লেখাপড়া শিখিয়েছিলে?"[৮]

সমকালীন সময়ে পরাগতির পক্ষপাতী রক্ষণশীল সমাজে এই ধরনের আধুনিক চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে শান্তা দেবীর প্রগতিশীল নারী নির্মাণের প্রয়াস লক্ষ করা যায়।

তবে, শুধু শিক্ষার জয়গান নয়। সেই শিক্ষাকে যথার্থ রূপে ব্যবহার না করে যদি শুধু দেখনদারি সর্বস্ব করা হয়, তাহলে তা যে দাঁড় কাকের ময়ূরপুচ্ছ ধারণ সদৃশ হয়ে দাঁড়ায়, তার আখ্যান নির্মাণ করেছেন 'ময়ূরপুচ্ছ' (প্রবাসী, চৈত্র ১৩২৫) গল্পটির মধ্য দিয়ে। লিলির বাবা হরিহর রক্ষণশীলতার মধ্যে বড় হলেও পরিণত বয়সে পৌঁছে সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে, ফিরিঙ্গানায় সমস্ত ইঙ্গ-বঙ্গকে হারিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টায় সচেষ্ট হলেন। সেই সংস্কারের বশবর্তী হয়ে লিলিকে ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয়ে ভর্তিও করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু, 'সৌম্যদর্শন', 'সুপুরুষ, 'ধনীর দুলাল' ইন্দুভূষণকে পাত্র হিসেবে পাওয়া মাত্রই তা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তৎক্ষণাৎ মনু-পরাশরের শরণাপন্ন হতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি। যে হরিহর একদিন আধুনিকতায় ইঙ্গ-বঙ্গকে পরাজিত করবার স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই হরিহরই স্বার্থ বসবর্তী হয়ে বন্ধু

মহলে ঘোষণা করলেন, "স্ত্রীলোককে যখন স্বামীর ঘরেই চিরকালটা বসবাস করতে হবে, তখন তার শিক্ষা দীক্ষা সেখানেই হওয়া উচিত। সুতরাং বাল্যবিবাহ অবসম্ভাবী।"[৯] এই দ্বিচারিতার ফলে লিলির জীবন সংকটাপন্ন হয়ে পড়ল। কারণ, এতদিন সে যা যা শিক্ষা পেয়েছিল, সেই সবকিছুর বিস্মৃতি ঘটিয়ে তাকে এখন এই বালিকা বয়স থেকেই স্বামীগৃহে অন্তঃপুরবাসী বন্দি জীবন কাটাতে হবে। হল-ও ঠিক তাই। মেদিনীপুরের এক মফঃসল শহরে তার বিয়ে হল। ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানের মতো সেখানে তখনও আধুনিকতার আলো প্রবেশ করেনি। সেখানে মেয়েদের জুতো পরিধানও লজ্জার শামিল, লেখাপড়া তো দূর অস্ত। এই পরিবেশে তার প্রতি পদক্ষেপে অপ্রস্তুত হয়ে পড়া, তাকে নিয়ে করা ব্যঙ্গ, তার উপর হওয়া অত্যাচার তার জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের ফলে মধ্যবিত্ত বাঙালির মধ্যস্থিত প্রাচীন প্রথা এবং আধুনিকতার যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়, তাকে সুচারুরূপে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে যে কী পরিমান বিপর্যয় ঘটে তার প্রমাণ এই গল্পটি। সুবিধাবাদী বাঙালির এই সাহেবিয়ানার অন্ধ অনুকরণ আসলে ঠুনকো, তা দাঁড় কাকের ময়ূরপুচ্ছ পরিধান সাদৃশ-এই কথাই ব্যক্ত হয়েছে গল্পটিতে। তবে, গল্পটিতে কথক শুধুমাত্র ময়ূরপুচ্ছ ধারণকারীদের সমালোচনা করেননি, করেছেন রক্ষণশীল, তমসাচ্ছন্ন সমাজকেও, যে সমাজের মধ্যে পড়ে বিপর্যস্ত হতে হয়েছিল লিলিকে।

শুধুমাত্র নারী শিক্ষা, নারী প্রগতিমূলক গল্প নয়, অন্যান্য নানা বিষয় অবলম্বনেও গল্প রচনা করেছেন শান্তা দেবী। তাঁর 'পৌষপার্বণ' (প্রবাসী, মাঘ ১৩২৪) গল্পটিতে পরিচর্যা পেয়েছে, এক সন্তানহীন গৃহবধূর, তার শিশু দেওয়ের প্রতি লালিত সন্তানস্নেহ। 'বেকার সমস্যা' (পথের দেখা) গল্পে এক মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বেকার যুবকের অন্তর্দ্বন্দ্ব, আর্থিক সংকট, পারিবারিক চাপ এবং সেই চাপে পড়ে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে তার সামগ্রিক জীবনে যে বিপর্যয় নেমে আসে, তারই চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। 'জীবে দয়া' (পথের দেখা) গল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে জাপান কর্তৃক আক্রমণের আশঙ্কায় কলকাতার শঙ্কাবহুল বিপর্যস্ত জীবনের ছবি অঙ্কিত হয়েছে। সুচারু রূপে ফুটিয়ে তুলেছেন সেই সংকটের মুহূর্তে মানবিকতার বিসর্জন দিয়ে সুবিধাভোগী মানুষের আখের গোছানোর চিত্র। 'ছুটি' (পথের দেখা) গল্পে দেখি, প্রতিদিনকার সাংসারিক জীবন থেকে ক্ষণিক অবসর পেতে একদিনের ছুটি চেয়েছিল গৌরী। বিবাহ পরবর্তী চোদ্দ বছরের জীবনে সে একদিনের জন্য ছুটি পায়নি। আর পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তাকে বুঝিয়ে এসেছে, মেয়েদের ছুটি বিবাহের মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যায়। তাই গৌরীর উপলব্ধি, "মুখ বুঝিয়া খাটিয়া খাটিয়া মরিবার জন্য স্ত্রীলোকের জন্ম, যত দিন হাত-পা আছে খাটিয়াই মরিতে হইবে।"[১০] পুরুষতান্ত্রিক সমাজে গৃহিণীদের সংসারসর্বস্ব করে রাখার বিরুদ্ধে কথকের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে এভাবেই। 'গৃহসংস্কার' (দেয়ালের আড়াল) গল্পে দেখি দত্তমশায় তাঁর জীবদ্দশায় সন্তানদের থেকে কোনও আদর-যত্ন, সেবা-শুশ্রুষা না পেলেও, তাঁর মৃত্যুর পর সেই সন্তানরা বিপুল আড়ম্বরের সহিত পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করে। এই গল্পে ধর্মের নামে আচার সর্বস্বতা নামক সামাজিক অপপ্রথার বিরুদ্ধে ব্যাঙ্গাত্মক প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। সেই সঙ্গে বার্তা দিয়েছেন এক সুষ্ঠু মানবতাবোধের, যেখানে বাবা-মায়ের প্রতি সন্তানের শ্রদ্ধা-ভক্তির স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠাটাই কাম্য।

শান্তা দেবী খুব বেশি উপন্যাস লেখেননি, গিলফিলের গল্প অবলম্বনে লেখেন 'স্মৃতির সৌরভ' (১৯১৮) উপন্যাসটি। সীতা দেবীর সাথে একত্রে লেখেন 'উদ্যানলতা' (১৯১৮) উপন্যাস। সংযুক্তা দেবী ছদ্মনামে লেখা উপন্যাসটিতে বাংলার শিক্ষিত মেয়েদের প্রতিদিনকার জীবন, তাদের ভাবনাচিন্তার জলছবি অঙ্কিত

হয়েছে। এই উপন্যাসে সেই সময়ের স্কুল পড়ুয়া মেয়েরা নিজেদের খুঁজে পায়। খুঁজে পায় মনের অব্যক্ত ভাবনার স্বরূপ। তাদের সেই চিন্তা-চেতনায় মুক্তি চরিত্রটি প্রভাব বিস্তার করত। কারণ, মুক্তি চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে নারী মুক্তি, নারী শিক্ষার বার্তা দেওয়া হয়েছে। রয়েছে স্বনির্ভরতার কথাও। সমকালীন বেথুন স্কুলের চালচিত্র এই উপন্যাসে ধরা রয়েছে। সেই সময়কার বহু দৃষ্টান্ত থেকে জানা যায় যে, বাড়িতে প্রবাসী পত্রিকা এলে প্রথম আকর্ষণ থাকত উদ্যানলতা উপন্যাসটির উপর। অন্তঃপুরবাসী নারীর বন্ধনমুক্তির প্রয়াস দেখতে পাই তাঁদের সেই প্রথম প্রচেষ্টাতেই। মুক্তিকে কখনওই রক্ষণশীলতার সাথে আপোস করতে দেননি শান্তা দেবী-সীতা দেবী, বরং প্রতিবাদ করিয়েছেন স্থাবরতার বিরুদ্ধে। ঔপন্যাসিকদ্বয় যে সংস্কারমুক্ত আধুনিক মন নিয়ে বড় হয়ে উঠেছিলেন, মুক্তিকে সেই ভাবেই এঁকেছেন। শান্তা দেবী-সীতা দেবীর কথাসাহিত্যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এই ধরনের চরিত্ররা কেউ-ই সাহেবিয়ানার অন্ধ অনুকরণ করে না, কথায় কথায় ইংরেজি বুলির ফুলঝুরি ঝরায় না, তারা পাশ্চাত্য শিক্ষার সদ্গুণকেই গ্রহণ করেছে। মুক্তির বাবা শিবেশ্বর চরিত্রটির মধ্যে রামানন্দের ছায়া পরিলক্ষিত হয়। রামানন্দের মতো তিনিও ছিলেন রক্ষণশীলতার বিরোধী আধুনিক এক ব্যক্তি। শান্তা দেবী-সীতা দেবীর গল্প-উপন্যাসে আধুনিক এইধরণের চরিত্র বারবার ফিরে এসেছে, যেখানে রামানন্দের ছায়া পড়েছে। শান্তা দেবীর অলখঝোরা উপন্যাসের চন্দ্রকান্ত, সীতা দেবীর মহামায়া উপন্যাসের নিরঞ্জন প্রভৃতি এ'ধরনের চরিত্র। অপরদিকে মুক্তির ঠাকুমা মোক্ষদাকে আঁকা হয়েছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রভাবপুষ্ট প্রাচীনপন্থী এক নারী চরিত্র হিসেবে। তাঁর সাথে মুক্তির লড়াই সেই চিরকালীন নবীন-প্রবীণের দ্বন্দ্বের মতোই। মুক্তি ব্যর্থ করতে সফল হয়েছে ধীরেনের সাথে তার বিয়ে দেওয়ার জন্য ঠাকুমার আপ্রাণ প্রচেষ্টাকে। কারণ, আত্মনির্ভরশীল মুক্তি জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার জন্য পরিবারের চাপিয়ে দেওয়া নীতিতে বিশ্বাসী নয়। তাই, জ্যোতির জন্য অপেক্ষার মধ্য দিয়েই উপন্যাসটির সমাপ্তি সাধিত হয়েছে।

শান্তা দেবীর প্রথম মৌলিক উপন্যাস 'চিরন্তনী' (১৯২১ খ্রি.)। উপন্যাসটিতে করুণা চরিত্রটির মাধ্যমে ঔপন্যাসিক নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ এবং নারীহৃদয়ের মধ্যেকার শুভ্র প্রেমের বিকাশক দেখিয়েছেন। জীবনের নানা জটিলতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রভৃতি বিষয় এই চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। দারিদ্র্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম তার চরিত্রে বিশিষ্টতা দান করেছে। সে আপন পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীল। ভাই বোন ও দাদামশাইয়ের দায়িত্ব ছিল তার কাঁধেই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক সংকট বাড়ির মেয়েদের জীবিকার সন্ধানে বাইরে বের হবার পথ কিছুটা হলেও মুক্ত করে দিয়েছিল। করুণা চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে সেই দৃষ্টান্ত লক্ষ করি, যা পরবর্তীকালে শান্তা দেবীর অন্যান্য উপন্যাস সহ সীতা দেবীর নানা উপন্যাসেও পরিলক্ষিত হয়। জীবিকার জন্য সে গ্রহণ করেছে স্কুল শিক্ষিকার চাকরি। অবিনাশ অর্থের প্রাচুর্যতার মাধ্যমে করুণাকে বশ করতে চেয়েছিল। তার প্রেমের নামে উগ্রতা, দম্ভ, জোর-জুলুমকে তাই সে অগ্রাহ্য করতে পেরেছিল। বেছে নিয়েছিল কোমল স্বভাব সম্পন্ন সুপ্রকাশকে, যে করুণার প্রেমকে যথার্থ মর্যাদা দিতে পারে। সেখানে তার আত্মগ্লানী নেই, নেই আত্মগোপনের ইচ্ছাও।

'জীবনদোলা' (১৯৩০ খ্রি.) উপন্যাসের মূল চরিত্র গৌরী বালবিধবা। কিন্তু, সেই বয়সে তা সে জানত না, উপলব্ধি করতে পারেনি কাকে বলে বিধবা, স্বামীকেও সে চেনে না। কিন্তু সমাজ তাকে বিধবার শাস্তি দেওয়ার জন্য ব্যাকুল ছিল। পরবর্তীকালে বোধ-বুদ্ধি জাগরণের ফলে যখন সে তার সেই সংকটকে উপলব্ধি করতে পেরেছে, তখন সে পারিবারিক ও সামাজিক দয়া-দাক্ষিণ্য ও লাঞ্ছনার হাত থেকে নিজেকে রক্ষার

উপায় হিসেবে সে শিক্ষাকে গ্রহণ করেছে। শিক্ষার মাধ্যমে সে স্বাবলম্বিতা অর্জনের চেষ্টা করেছে। উপন্যাসটিতে নারীর স্বামী সর্বস্বতার বিরুদ্ধেও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। উপন্যাসটির প্রেক্ষাপট ১৯২৩-এর কলকাতা শহর, যখন বাস্তবে তো বটেই, সাহিত্যেও বিধবা বিবাহের চল খুব বেশি ছিল না। কিন্তু শান্তা দেবীর তাঁর নায়িকাকে আধুনিক করে গড়ে তুলেছেন। তাই তো, বালবিধবা গৌরী সঞ্জয়কে বিবাহের মাধ্যমে সমাজের বৈধব্য নামধারী সংস্কারকে জয় করতে পেরেছে। এই উপন্যাসে শংকটাপন্ন তরুণীদের আশ্রয়দানের উদ্দেশ্যে নির্মিত হৈমন্তী নারী আশ্রমের উল্লেখ পাই, যা সেবাব্রতী শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মহেশচন্দ্র আতর্থীর নারীরক্ষা সমিতির আদর্শে গড়ে উঠেছে। সেই সময়ের পুরুষদের ভাবনাচিন্তার আভাসও পাই এই উপন্যাসে। স্বদেশী যুবকদের প্রসঙ্গ এনেছেন লেখিকা, দেখিয়েছেন নারী-পুরুষের সহাবস্থান। তারা সঙ্গবদ্ধভাবে সমাজসেবায় অংশগ্রহণ করছে। নারী-পুরুষের একত্রে অবাধ মেলামেশার চিত্র আমরা 'অলখঝোরা' (১৯৪৩) উপন্যাসেও দেখি। সুধা, হৈমন্তী, নিখিল, সুরেশ, তপন, মহেন্দ্র নামের এই যুবক-যুবতীদের ভাবনাচিন্তা, সংস্কারের মধ্যে আধুনিকতার সুর ধ্বনিত হয়েছে; খোশ গল্পের মধ্য দিয়েও বেরিয়ে এসেছে সুগভীর আলোচনা, যা রক্ষণশীল সমাজকে ধাক্কা দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

আরও একটি বিশিষ্ট উপন্যাস 'দুহিতা' (প্রকাশকাল অনুল্লেখিত)। উনিশ শতকের বাংলায় যে আধুনিক ধ্যান-ধারণার সূত্রপাত হয়, তা নারীদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। ফলে তাঁদের মধ্যেকার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ ও আত্মমর্যাদাজ্ঞান উন্মেষের যে সূত্রপাত ঘটে, পরবর্তীকালে তার যে সুদূরপ্রসারী রূপ আমরা লক্ষ করি, তারই প্রতিচ্ছবি পাই এই উপন্যাসের নারায়ণী ও কল্যাণী চরিত্রদুটির মধ্যে। কাত্যায়নীর বিবাহের সময় দেখা গেল, পাত্র অন্ধ। এও জানা গেল, তার বাবা-ই পাত্রপক্ষের থেকে মোটা অঙ্কের পণ নিয়ে এই বিবাহে রাজি হয়েছে। এমন ঘটনায় স্বভাবতই ক্ষুব্ধ হয় আধুনিকতাবোধ সম্পন্ন নারায়ণী। পাত্রের সাথে বিবাহের সম্বন্ধকে ভেঙে দিতেও সে কুণ্ঠিত হয়নি। আধুনিকতা নারীকে ভাবতে শিখিয়েছে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের কথা। সেই ধারণা শান্তা দেবীর মধ্যেও ছিল। তাই তো নারায়ণীর সংলাপে শুনতে পাই যে, তার কাছে পুত্র সন্তান-কন্যা সন্তানের কোনও ভেদাভেদ নেই। উভয়েই তার কাছে সমান।

সীতা দেবী গল্প লিখেছেন অসংখ্য। তবে, তাঁর অধিকাংশ গল্পই উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত। এবং তিনি সহজ সরলভাবে, গল্প শোনানোর আনন্দেই তা বর্ণনা করে গেছেন। ছোটগল্পের পরিমিতি, সংহতি, লক্ষ্যাভিমুখী ঋজুগতি সেক্ষেত্রে বহুলাংশেই অনুপস্থিত থেকেছে। তবুও কোনও সাহিত্যই সমাজকে বঞ্চিত করে সৃষ্ট হতে পারে না। তাই সমকালীন সমাজের দুই ভয়াবহ ব্যাধি বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ তাঁর কোনও কোনও রচনার বিষয়বস্তু হয়েছিল। 'পূজার তত্ত্ব' (প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৩২) গল্পে সেই দুই ভয়াল প্রথার কবলে পড়তে দেখি কাত্যায়নী নামের এক দশ বছরের বালিকাকে। আমরা বুঝতে পারি, বিশ শতকেও সমাজ কতটা সমস্যা জর্জরীত ছিল। পিতা-মাতাহীন কাত্যায়নী দরিদ্র জ্যাঠামশাইয়ের কাছে বড় হয়ে ওঠে। সামাজিক চাপে ও একঘরে হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তিনি ওই বয়সেই তাকে বিবাহ দিতে বাধ্য হন। কিন্তু বিবাহের পণের টাকা পুরোপুরি দিতে না পারায় তাঁকে হতে হয় অপমানিত। শ্বশুরবাড়িতে কাত্যায়নীকে হতে হয় চরম অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত। জ্যাঠামশাইকে সে জানায়, "আমাকে একবেলা মোটে খেতে দেয়, আর সবাই মিলে বকে, মাঝে-মাঝে মারে।"[১১] রচনাটির সাথে রবীন্দ্রনাথের দেনা-পাওনা (১২৯৮) গল্পের মিল খুঁজে পাই। সীতা দেবীরও ওই একই নামের একটি গল্প রয়েছে। সেখানেও বাল্যবিবাহ, পণ প্রথারূপ এক জ্বলন্ত সামাজিক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। যে রামতারণ ঘোষাল প্রচুর অর্থ ও অলঙ্কার পণ হিসেবে গ্রহণ করে

বিবাহ করেছিলেন, সেই রামতারণকেই নিজের মেয়েদের বিবাহ দিতে গিয়ে সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করে গৃহহীন হতে হয়। তবে গল্পের শেষ একখানেই নয়। তৃতীয় কন্যা সুধা অধিক শ্যামবর্ণ হওয়ায় রামতারণকে সর্বাধিক খরচ করতে হয়েছিল। পরবর্তীকালে দেখা যায়, সুধার স্বামীর নিজের কন্যা সন্তানদের বিবাহের খরচ জোগাড় করতে গিয়েও পথে বসার উপক্রম ঘটে। তার কথায়, "কি দেশেই জন্মেছি বাবা, মানুষ এখানে কসাইয়েরও অধম। ছেলের বাপ হয়েছে তো বিশ্বের মাথা কিনে নিয়েছে।"[১২] এইভাবে পুরুষাণুক্রমে, যুগের পর যুগ সমাজে প্রচলিত হয়ে আসছে এই পণপ্রথারূপ এক ভয়ঙ্কর সমস্যা। আজকের দিনেও যে সমস্যা পুরোপুরিভাবে মেটেনি।

রক্ষণশীল আচারনিষ্ঠ হিন্দু পরিবারের এক বালবিধবা কন্যা উমার লাঞ্ছনা, গঞ্জনার চরম মর্মান্তিক কাহিনি 'স্মৃতিরক্ষা' (বজ্রমণি) গল্পটি। তার সাথে স্কুল শিক্ষক বিশ্বনাথের অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে-এই সন্দেহে তাকে কাশী পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়। এই সময়ে তার মাথা মুড়িয়ে, ত্রিবেণীতে স্নান করে সমস্ত পাপস্খালন করতে বলা হলে, সেই অপমান, গঞ্জনা সহ্য করতে না পেরে ত্রিবেণীর যমুনার জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে নিজের জীবনাবসান ঘটায় সে।

'উগ্রচণ্ডা' (প্রবাসী, আশ্বিন ১৩২৪) গল্পে দেখি, আপাতভাবে যে ফিরিঙ্গি মহিলাকে মনে হয়েছিল প্রচণ্ড রাশভারী, দয়ামায়াহীন; পরবর্তীকালে সেই মহিলারই মধ্যে দেখতে পাই স্নেহপ্রবণ মাতৃরূপের ছবি। জানা যায় যে, সন্তান বিকলাঙ্গ হওয়ার কারণে তাকে খাট থেকে ফেলে দেয় তাঁর স্বামী। মারা যায় শিশুটি। পরবর্তীকালে তাই তিনি যখন দেখেন, অপর এক মহিলা বিকলাঙ্গ সন্তান প্রসব করায় তার স্বামী, শিশুটিকে নদীতে ফেলে দিতে চায়, তখনই উগ্রচণ্ডা নামধারী সেই মহিলার পরম মাতৃমূর্তি পরিস্ফুট হয়। শিশুটিকে তার বাবার হাত থেকে রক্ষা করে তার সেবাযত্নের সমস্ত ভার স্বেচ্ছায়, পরম আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করেন। 'আলোর আড়াল' (আলোর আড়াল ও অন্যান্য গল্প) গল্পে লেখিকা দেখান, বাহ্যিক সৌন্দর্যের অন্তঃসারশূণ্যতা। একমাত্র অন্তরের রূপকেই সত্য বলে প্রতীয়মান করেন তিনি। অন্ধ ধরণীমোহনকে অপরিসীম স্নেহ, সেবা-যত্ন দিয়ে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে তার স্ত্রী 'কুৎসিত' মলিনা। দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার পর ধরণীমোহন সেই 'কুৎসিত' মলিনার সমস্ত আন্তরিকতা ভুলে তাকে অস্বীকার করে। পরবর্তীকালে আবারও সে অন্ধ হয়ে যায়। তখন সে আর মলিনাকে চিনতে ভুল করেনি। তাদের মধ্যে স্থায়ী মিলন সম্পন্ন হয়।

গল্পের তুলনায় উপন্যাস রচনায় সীতা দেবী অধিকতর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসের মূল নারী চরিত্রগুলির বুদ্ধিদীপ্ত মননশীল হৃদয়বৃত্তির প্রতিফলন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নারী সমস্যার জটিল রূপ প্রকাশই তাঁর অধিকতম আগ্রহের স্থান। অপরদিকে, তিনি সুনিপুনভাবে উপস্থাপন করেছেন নারীহৃদয়ে বিকশিত প্রেমের বিভিন্ন রূপ। তাঁর প্রথম মৌলিক উপন্যাস 'সোনার খাঁচা' (১৯২০ খ্রি.)। প্রেমের সার্থকতা অর্থের ভিত্তিতে হয় না, তা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ের উপর নির্ভরশীল- এই প্রতিপাদ্য বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে এই উপন্যাসে। তাঁর 'রজনীগন্ধা' (১৯২১ খ্রি.) উপন্যাসটির সাথে শান্তা দেবীর 'চিরন্তনী' উপন্যাসের মিল থাকলেও, সীতা দেবীর উপন্যাসটি অনেক বেশি পরিণত রচনা। 'বন্যা' (প্রকাশকাল অনুল্লেখিত) উপন্যাসটি নারীর সামাজিক অসাম্য, প্রতিকূলতাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুবর্ণ বাল্যবিবাহের শিকার। তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও, তার প্রগতিশীল বাবা প্রতুলচন্দ্রের নিষেধ অমান্য করে, তাঁর অজ্ঞাতসারে, সুবর্ণর মা-ঠাকুমার পরিকল্পনায় তাকে জোরপূর্বক বিবাহ দেওয়া হয় শ্রীবিলাসের সাথে।

বিবাহ পরবর্তীকালে সুবর্ণ নতুন পরিবেশে কোনওভাবেই খাপ খাওয়াতে পারেনি। পরে তার বেশ কিছু আচরণের জন্য তাকে সেই বাড়ি থেকেও তাড়িয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে এই সুবর্ণ (পরিবর্তিত নাম সুপর্ণা)-র সংগ্রামশীলতার মধ্য দিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ, ডাক্তার হওয়ার মাধ্যমে সেই শিক্ষার পরিপূর্ণতা ও এরই মাঝে সুদর্শনের সাথে তার ঘনিয়ে ওঠা সম্পর্কই উপন্যাসের মূল কাহিনিবস্তু। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে গৃহবধূদের থেকে পুত্রসন্তানের কামনা, কন্যাসন্তান গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করার দৃষ্টান্ত 'পরভৃতিকা' (১৯৩০ খ্রি.) উপন্যাস। উচ্চবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করা কৃষ্ণা শুধুমাত্র মেয়ে হওয়ার কারণে জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সকল অধিকার এমনকি মায়ের কোল থেকে বঞ্চিত হয়। তাকে স্থানান্তরিত করা হয় ভিন্ন স্থানে। এই কৃষ্ণার জীবনসংগ্রাম এবং স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টাই এই উপন্যাসে পরিচর্যা পেয়েছে। 'মহামায়া' (১৯৬১ খ্রি.) উপন্যাসটির প্রেক্ষাপট খানিকটা 'বন্যা'-র মতোই। সেখানেও প্রগতিশীল পিতা বনাম পরাগতির পক্ষপাতী মাতার দ্বন্দ্ব এবং পরিশেষে আধুনিকতার জয় ঘোষিত হয়েছে। রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারের কন্যা সাবিত্রী তার সনাতন ধর্ম সংস্কার ভুলে আধুনিকতাবোধ সম্পন্ন স্বামী নিরঞ্জনের সাথে বিদেশে বসবার করতে অস্বীকার করে। তার কন্যা মায়াকেও সে নিজের মতো করেই বড়ো করে তুলতে চেয়েছিল। যদিও আধুনিকতার অভিঘাত মায়াকে আধুনিক রুচি সম্পন্ন নাগরিক হিসেবেই গড়ে তোলে। এই উপন্যাসের একটি আকর্ষণীয় বিষয়, কোনও এক আকশ্মিক অভিঘাতে মায়ার স্মৃতিশক্তির লোপ, এবং পরে এক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে তার স্মৃতিশক্তির ফিরে আসা। ঘটনাটি প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন,

> "বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে লেখিকা নিজের আসন অনেক দিনই সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাহার লিখিত এই উপন্যাসখানির গল্পাংশের মধ্যে তিনি যে নূতন বিষয়টির অবতারণা করিয়াছেন, এ ধরণের ব্যাপার লইয়া আমাদের দেশে আর কোন বই লেখা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না । নূতন জিনিষের অবতারণা করা অনেক সময়েই লেখকের শক্তি ও সাহসের পরিচয়। কারণ, লেখক মাত্রেই জানেন পাঠককে সব কথা বিশ্বাস করানো যায় না সব সময়। সামান্য কথা বিশ্বাস করাইতেও নানা কৌশলের প্রয়োজন হয়। এ হিসাবে আলোচ্য গল্পটির মধ্যে মায়ার মূর্চ্ছারোগ ও তার ফলে তাহার স্মৃতিবিলোপ এবং পুরাতন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব একটি বোল্ড এক্সপেরিমেন্ট এবং লেখিকা নিজের শক্তিবলে ঘটনাটি আমাদিগকে বিশ্বাস করাইয়াছেন।"[১৩]

আলোচিত রচনাগুলি ছাড়াও আরও বহু গল্প, উপন্যাস লিখেছেন সীতা দেবী। দীর্ঘদিন রেঙ্গুনে বসবাসের কারণে সেই পটভূমিতে লেখা গল্প-উপন্যাস পরভৃতিকা, মহামায়া, ক্ষণিকের অতিথি উপন্যাস। মুক্তির মূল্য, উগ্রচণ্ডা, পঙ্কজার মতো বহু গল্প সেই বার্মার পটভূমিতেই রচিত।

প্রবন্ধ সাহিত্যের ক্ষেত্রেও দুই বোন, বিশেষত শান্তা দেবী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতি, শিল্প প্রভৃতি নানা বিষয়ে তথ্যবহুল ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনা পাই তাঁদের কলমে। শান্তা দেবী-র 'স্ত্রীলোকের অধিকার' (প্রবাসী, ১৩২৪ পৌষ) প্রবন্ধে তিনি রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থার প্রচলিত পুরাতন সংস্কারের পুনঃনির্মাণের দাবি জানান। এরপর তিনি যান, নারী শিক্ষা-নারী প্রগতির প্রসঙ্গে। যেহেতু এতদিন নারীকে অন্তপুরে আবদ্ধ রাখা হয়েছে তাই বর্তমানে তারা স্বল্প কিছু কৃতিত্ব স্থাপন করলেই আমরা তাকে নারীর উচ্চ শিক্ষা, স্ত্রী স্বাধীনতা, নারী-পুরুষের সমান অধিকার নামে গালভরা প্রশংসা করছি। এতে তাদের ক্ষতিই হচ্ছে। তাই তা না করে, তাদের উন্নতির পথ আরও প্রশস্ত ও দিগন্তব্যাপী করার প্রয়োজন। পরিশেষে তিনি পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার চাবিকাঠির সন্ধান দেন এইভাবে, পুরুষের সাথে পুরুষের চিন্তার

মিলন ঘটলে যেমন পুরুষ গড়ে ওঠে, নারীর সাথে নারী চিন্তার মিলনে যেমন একজন নারী গড়ে ওঠে, তেমনই পুরুষের সাথে নারীর চিন্তার মিলনের ফলেই একজন পরিপূর্ণ মানুষ গড়ে ওঠে।

'নাম' (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩০) প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক নারীর নিজস্ব নামের দাবি জানিয়েছেন, যাতে বিবাহের পর অথবা অন্য কোনও কারণে তার নাম, পদবী কোনওটারই বদলাবার প্রয়োজন না পড়ে। 'নারী-সমস্যা' (প্রবাসী, পৌষ-মাঘ ১৩৩০) প্রবন্ধের শুরুতে প্রাবন্ধিক মেয়েদের জ্ঞানলাভ, নির্মল আনন্দ উপভোগ, ভ্রমণ, নিজস্ব মত প্রকাশের অধিকারের বৈষম্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। নারী সমস্যা বলতে, নারীর শিক্ষা, স্বাধীনতা, বিবাহ ও বৈধব্য সমস্যাকে বুঝিয়েছেন তিনি।

"উচ্চাঙ্গের স্ত্রীশিক্ষার যে প্রয়োজন আছে, স্বাধীনতা যে সকল মানবের অর্থাৎ নারীরও জন্মলব্ধ সম্পত্তি, এবং বাল্যবিবাহের, বিশেষতঃ বাল্যমাতৃত্বের, ফলে যে নারীর দেহ মন ও ভবিষ্যৎ বংশের বহু ক্ষতি হয়, এসকল কথা এদেশেও আর নূতন নয় । যাঁহার মস্তিষ্কে কিছু সার পদার্থ আছে, হৃদয়ে স্নেহ প্রেম আছে এবং নিহিত ও পরহিতের দিকে দৃষ্টি আছে, তিনিই এ-সকল কথার সত্যতা মনে মনে স্বীকার করেন।"[১৪]

এর পরেও যারা নারী মুক্তি নারী শিক্ষা নারী স্বাধীনতার বিপক্ষে এবং বাল্যবিবাহের পক্ষে কথা বলেন তাদের বিরুদ্ধে কলম হাতে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন তিনি বারবার। দেশ বিদেশে প্রচলিত নানা সংস্কার, কুসংস্কার এবং সমাজে তার প্রভাব নিয়ে আলোচিত হয়েছে 'প্রথার পীড়ন' (প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩২৫) প্রবন্ধে।

সাহিত্যের সাথে ধর্মের তুলনা, ধর্ম ও সাহিত্যের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে লিখেছেন 'ধর্ম ও সাহিত্য' (প্রবাসী, আশ্বিন ১৩২৫)। 'ভাষা ও সাহিত্য' (প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪০) প্রবন্ধে, উন্নতমানের সাহিত্যের জন্য যে উন্নতমানের ভাষার ব্যবহার আবশ্যক, সে প্রসঙ্গে বলেন, "ভাষাই সাহিত্যের বাহন, সুতরাং সাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও উন্নত ও মার্জিত হওয়া প্রয়োজন। শুধু যে প্রয়োজন তাহা নয়, উন্নত সাহিত্যের একটি বিশেষ লক্ষণ সুমার্জ্জিত, সুসংবদ্ধ ও সুসমঞ্জস ভাষা। ভাষার গঠনে ও ভঙ্গীতে শ্রী না ফুটিলে সাহিত্য কখনও শ্রীমণ্ডিত হইতে পারে না।"[১৬] অযোগ্য ব্যক্তিদের হাতে কীভাবে বাংলা ভাষার ক্ষতি হচ্ছে সেই বিবরণ দেওয়ার পাশাপাশি শব্দ চয়ন, শব্দ যোজনা, চলিত ভাষার ক্রিয়া সমস্যা সম্পর্কে নিজের সুচিন্তিত মত পোষণ করেছেন এই প্রবন্ধে। প্রবন্ধটির সাথে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বাঙ্গালা ভাষা' (বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫) ও 'নূতন কথা গড়া' (বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮) প্রবন্ধদুটির মিল পাওয়া যায়। 'প্রাচীন ও নবীন সাহিত্য' (প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৫৭)-তে তিনি সাহিত্যের মূল ভিত্তি সম্বন্ধে বলেছেন, "...সাহিত্যেও আমরা যতই প্রাচীনকে দূরে ঠেলে বলি-আমরা আধুনিক, আমরা নূতন-দেখা যায় আমরা সেই প্রাচীনেরই রসপুষ্ট নবীন আবির্ভাব।"[১৫]

নারী উন্নয়নের স্বার্থে নানা সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠা উনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই শুরু হয়ে যায়, বিশ শতকে এসে যার বিস্তৃতি ঘটে। তেমনই একটি সমিতি 'বাণীভবন'-এর উদ্দেশ্য, কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষদের অবগত করেন শান্তা দেবী তাঁর রচনার মাধ্যমে। 'নারীদের চারু ও কারু শিল্পশিক্ষা' (প্রবাসী, মাঘ ১৩৩৩), 'কারু শিল্পের পুনরুদ্ধার' (প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৪) প্রভৃতি প্রবন্ধে প্রথাগত শিক্ষার অপূর্ণতার দিকটির উল্লেখ করে নারী শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনের দাবি জানিয়েছেন। সেখানে শিক্ষার মাধ্যমে মানবিকতার বিকাশ, জ্ঞানের বিকাশের সাথে উপার্জনের দিকটি গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। এই শিক্ষারই একটি অঙ্গ, চারু ও কারু শিল্পের শিক্ষাদান এবং লুপ্তপ্রায় সেইসব শিল্পের পুনরুদ্ধারের জন্য সচেষ্টতাও

দেখিয়েছেন। বিভিন্ন শিল্প প্রদর্শনীর বর্ণনা দিয়েছেন 'শিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন রায়ের প্রদর্শনী (প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৯), 'নিউ দিল্লীতে চিত্র প্রদর্শনী' (প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৩) প্রভৃতি রচনায়।

শান্তা দেবীর তুলনায় সীতা দেবীর প্রবন্ধ সংখ্যা সামান্যই। তবুও তাতে বৈচিত্রের হানি ঘটেনি। বাল্য বিবাহের কুফল সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি, "দেশের শ্রী যাঁরা, তাঁদের যদি ক্রমাগত পরদা-চাপা দিয়ে রাখা হয়, তাহলে দেশের প্রতি অবিচার করা হয়।"[১৭] 'নারীর কাজ' (বঙ্গলক্ষ্মী, ফাল্গুন ১৩৩৭) প্রবন্ধে বিশ শতকের দু'এর দশকের নারী প্রগতির তীব্রতার উল্লেখ করার পাশাপাশি তার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেও, 'দেশের কাজে বাংলার মেয়ে' (বঙ্গলক্ষ্মী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৭) প্রবন্ধে উক্ত বিষয়ে তাঁর অভিমত, "আমরা যে কোনো অংশে পুরুষের চেয়ে হীন নই, তাহা শুধু বক্তৃতায় জাহির করিলে ও কাগজে লিখিলে হইবে না, উহা আমাদের হাতে কলমে করিয়া দেখাইতে হইবে।"[১৮] বাংলার মহিলাদের ভোটের দাবি সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করেছেন প্রবাসীর পাঠকদের মধ্যে। এছাড়াও নারী বিষয়ক তাঁর আরও বেশ কিছু রচনা হল- 'বঙ্গনারী' (কল্লোল, মাঘ ১৩৩০), 'ব্রহ্মনারী' (বঙ্গলক্ষ্মী, আষাঢ় ১৩৩৫), 'পারস্যে নারী' (বঙ্গলক্ষ্মী, চৈত্র ১৩৩৭), 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' (প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২) প্রভৃতি।

'সাহিত্যের ভাষা ও বস্তু' (প্রবাসী, মাঘ ১৩৪১) প্রবন্ধে 'সংস্কৃতগ্রন্থি পুরাতন' বাংলা ভাষা এবং আধুনিক 'হালকা ও পলকা' ভাষার পরিবর্তে সহজ সরল চলতি ভাষার পক্ষাবলম্বনের কথা জানান তিনি। সাহিত্যের বস্তুর প্রসঙ্গে তিনি জানান, পাশ্চাত্যের মোহে ভেসে যাওয়া এবং কেবলমাত্র প্রাচ্যকে আঁকড়ে বসে থেকে আধুনিক সমস্ত কিছুকে অস্বীকার করা- উভয়ক্ষেত্রেই বিপদ সমভাবে প্রযোজ্য। তাই, "দেশ-বিদেশের সমস্ত জিনিস সমান আদরে গ্রহণ না করিয়া তাহার ভিতর হইতে সার জিনিষটুকু গ্রহণ করিয়া লইতে পারিলে সর্ব্বাপেক্ষা ভালো হয়।"[১৯] বিদ্যাসাগর এর কৃতিত্ব নিয়ে লিখেছেন 'বিদ্যাসাগর' (প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৭৭) প্রবন্ধটি।

শান্তা দেবী-সীতা দেবীর জীবনী ও স্মৃতিকথাধর্মী সাহিত্যে তাঁদের ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্য জীবনের পাশাপাশি তৎকালীন সমাজের ইতিহাসের বহুবর্ণ মানচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তাঁদের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি কখনও কখনও তাঁদের গল্প-উপন্যাসের রসদও জুগিয়েছে। শান্তা দেবীর স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ 'পূর্বস্মৃতি' (১৯৮৩)-তে তিনি নিজের অতীত চারণ করতে গিয়ে সমসময়কে তুলে ধরেছেন। আলোচিত হয়েছে সেই সময়ের বঙ্গভঙ্গ সহ আরও বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রসঙ্গ। রামানন্দের কন্যা হওয়ার সুবাদে রবীন্দ্রনাথকে পেয়েছেন খুব কাছ থেকে। এই প্রাপ্তির মূল্য তাঁর জীবনের অন্তিম দিন পর্যন্ত উপলব্ধি করে গেছেন তিনি। অপরদিকে সীতা দেবীর 'পুণ্যস্মৃতি' (১৯৪২) পুরোপুরিভাবে রবীন্দ্রস্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ। ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে আমরা এই গ্রন্থের মাধ্যমে খুঁজে পাই। সেই সময়ের শান্তিনিকেতনের ছবিও অনিবার্যভাবে ধরা পড়েছে এই গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও উপেন্দ্রকিশোর রায় চোধুরী, সুকুমার রায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, নীলরতন সরকার, কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, অবলা বসু সহ বহু বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের প্রসঙ্গ তাঁদের স্মৃতিকথায় ধরা পড়েছে। সীতা দেবী নিজের পিতার স্মৃতিচারণ করেছেন 'পিতৃস্মৃতি' রচনাটিতে। এছাড়া, নিজের বিগত জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন 'নানা রং-এর দিনগুলি' (প্রবাসী, কার্তিক ১৩৭৩-মাঘ ১৩৭৪) রচনায়। 'ভারতমুক্তিসাধক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা' (১৯৪৫) গ্রন্থে শান্তা দেবী তাঁর বাবা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-এর জীবন ও কর্মজীবনের চিত্র অঙ্কন করেছেন নিপুণতার সাথে। প্রসঙ্গত চলে এসেছে রামানন্দ সম্পাদিত 'প্রবাসী', 'মডার্ণ রিভিউ', 'প্রদীপ', 'ধর্মবন্ধু' পত্রিকার ইতিহাস।

সেইসঙ্গে সমকালীন বাংলা তথা ভারতবর্ষের বহুবর্ণ মানচিত্র- সমাজ, রাজনীতি, ব্রাহ্মসমাজ, রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ প্রভৃতি উঠে আসে। গ্রন্থটি প্রণয়নের জন্য তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূবনমোহিনী স্বর্ণপদকে ভূষিত হয়েছিলেন (১৯৪৯)।

দেশ-বিদেশে পাড়ি দিতেন শান্তা দেবী। আর সেই ভ্রমণ অভিজ্ঞতার সচিত্র বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন 'প্রবাসী' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায়। উক্ত রচনাগুলিতে ভ্রমণ অভিজ্ঞতা বর্ণনার পাশাপাশি সেখানকার সমাজ-সংস্কৃতি, বাংলার সাথে উক্ত স্থানের তুলনামূলক আলোচনাও উঠে আসে। এছাড়া, মৌলিক রচনা সৃষ্টির পাশাপাশি শান্তা দেবী-সীতা দেবী অনুবাদক হিসেবেও নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। নিজেদের সৃষ্ট সাহিত্য ইংরেজিতে অনুবাদের পাশাপাশি ফরাসি, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষায় রচিত সাহিত্যের বাংলা অনুবাদও করেছেন। এগুলির মধ্যে একদিকে যেমন আছে ছোটগল্প, উপন্যাস, অন্যদিকে আছে শিশু-কিশোর উপযোগী গল্প। অনুবাদের ক্ষেত্রে ভাষা হয়ে উঠেছে প্রাঞ্জল-সাবলীল, সেখানে তাঁদের স্বকীয়তাও বিরাজমান।

প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এর মতো শান্তা দেবী-সীতা দেবীও বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষামূলক কাজ-কর্মের সাথে যুক্ত ছিলেন। সামাজিক কাজের জন্য গঠিত 'সোশাল ফ্রেটারনিটি'(১৯২১)-র সম্পাদিকা ছিলেন সীতা দেবী। সেই কাজে তাঁর যোগ্য সহকারী সুশোভন সরকার সংস্থাটি সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেছেন এইভাবে,

"আমরা তখন কলেজের ছাত্র। পরিবারের বাইরে ছেলেমেয়েদের মেলামেশার সুযোগ, বন্ধুত্ব স্থাপনের সুবিধা চোখে পড়ত না...। সমাজপাড়ায় একটা ঘরোয়া ক্লাবের অভাব আমরা খুবই অনুভব করতাম, সেই তাগিদেই সোশাল ফ্রেটারনিটির সৃষ্টি।...সীতা দেবীর সাহিত্যিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা, তাঁর বিদ্যা ও বুদ্ধির খ্যাতি, তাঁর স্থৈর্য ও সৌজন্য, প্রগতিশীল পারিবারিক শিক্ষা, অটল ব্যক্তিত্ব হয়েছিল আমাদের পরম সম্পদ।"[২০]

"...এই প্রতিষ্ঠান ব্রাহ্ম ও অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মনে সাড়া তুলেছিল, এনেছিল এক নতুন জীবনের স্পন্দন। তাঁরা 'দুর্জয় প্রাণের আনন্দে' এগিয়ে চলতে চেয়েছিলেন।"[২১]

সমকালীন সময়ে পুরুষ-নারীর একত্রে অবস্থানের মাধ্যমে কলাবিদ্যা চর্চার এই দৃশ্যটি খুব একটা সুলভ ছিল না। এর সভায় রবীন্দ্রনাথও উপস্থিত থাকতেন। সেখানে সাহিত্য, সমাজ-সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হত। সাহিত্য পাঠ করতেন রবীন্দ্রনাথ, মনীন্দ্রলাল বসু, নীরেন্দ্রনাথ রায়, শান্তা দেবী, সীতা দেবী প্রমুখ। হিন্দু আর্টের আদর্শ নিয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন নীরেন্দ্রনাথ রায়। এছাড়া আরও বৈচিত্রময় বিষয়ে আলোচনা চলত।

শান্তা দেবী হেমলতা ঠাকুরের 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকাতে কাজ করতেন, 'সাধনা' সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন। শান্তিনিকেতনে তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হত 'শ্রেয়সী' পত্রিকা। তাঁর আঁকা বিভিন্ন ছবি প্রবাসী সহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, বিদেশেও পাড়ি জমিয়েছে। বাল্যসমাজ, শিশুসমিতি, মহিলা সমিতি, ছাত্রসমাজের মতো বিভিন্ন সভা-সমিতির সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন তিনি। রাজনৈতিক সমাবেশে শান্তা দেবী-সীতা দেবীর যোগদানের প্রসঙ্গ তো পূর্ব আলোচিত। দুই বোন মিলে

পাড়ার দুস্থ শিশুদের জন্য নৈশ বিদ্যালয়ও চালু করেছিলেন। অর্থাৎ, আমরা বুঝতে পারি, শুধু সাহিত্যজগতে নয়, সমাজ-শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রেই তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য।

উনিশ শতকীয় বাংলায় আধুনিক ভাবনা-চিন্তার ধারাবাহিকতার একটি অন্যতম দিক ছিল নারীজাগরণ। এতদিন নারীরা ছিলেন ব্রাত্য, উপেক্ষিত, অন্তঃপুরবাসী। আধুনিক শিক্ষার আলো তাঁদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের ভাবনা ভাবতে শিখিয়েছে। এই নারীজাগরণ বিষয়টি সাহিত্যের মাধ্যমে তার ডালপালা বিস্তার করতে থাকে। বিশ শতকীয় প্রেক্ষাপটে শান্তা দেবী-সীতা দেবী ভিন্ন ধারার সাহিত্য সৃষ্টি করেন, যেখানে নারী অন্তঃপুরবাসী বন্দী জীবনকে অতিক্রম করে স্বাবলম্বী হওয়ার প্রয়াস দেখিয়েছে। উদারমনস্ক চিন্তাবিদ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যাঁদের পিতা, তাঁদের মধ্যে আধুনিক, পরিবর্তিত ধ্যান ধারণার প্রভাব পরিলক্ষিত হবে এটাই তো স্বাভাবিক। এই ধরনের সাহিত্য বাংলা তথা ভারতবর্ষের নতুন নারীর নির্মাণের ভিত্তি প্রস্তুতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নারীসভা এবং লেখিকাদের সাংস্কৃতিক সভা 'সাহিত্যিকা'-র উদ্যোগে যে ছয়জন লেখিকাদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়, সেই ছয় জনের মধ্যে শান্তা দেবী-সীতা দেবীও ছিলেন। এখানেই সাহিত্যিক হিসেবে তাঁদের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও, শান্তা দেবী-সীতা দেবীর রচনাও ত্রুটিমুক্ত ছিল না। তাই, বাংলার প্রবাদপ্রতিম সাহিত্যিকদের নামের পাশে তাঁদের নামের উল্লেখ পাই না। তবু, আধুনিক নারীকেন্দ্রিক ভাবনা-চিন্তার যে ধারা প্রবহমান, তার প্রস্তুতিপর্বে যে কয়েকজন কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছিলেন, শান্তা দেবী-সীতা দেবী তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

উল্লেখপঞ্জি:

1) নাগ, শান্তা। পূর্বস্মৃতি। কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৩৬৩। পৃ. ২। মুদ্রিত।
2) তদেব। পৃ. ৩৩।
3) তদেব। পৃ. ৪৬।
4) বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা। কলকাতা মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৪৫। পৃ. ২৮৯। মুদ্রিত।
5) দেবী, শান্তা। 'উষসী', সুনন্দা। কলকাতা: প্রবাসী কার্য্যালয়, ১৩১৮। পৃ. ৩০-৩১। মুদ্রিত।
6) দেবী, শান্তা। 'উষসী', পিতৃদায়। কলকাতা: প্রবাসী কার্য্যালয়, ১৩১৮। পৃ. ১০৭। মুদ্রিত।
7) দেবী, শান্তা। 'পথের দেখা', মানসী। কলকাতা: কমলা বুক ডিপো, ১৯৪৪। পৃ. ৮৮। মুদ্রিত।
8) তদেব।
9) দেবী, শান্তা। "ময়ূরপুচ্ছ"। প্রবাসী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, অষ্টাদশ ভাগ-দ্বিতীয় খণ্ড, চৈত্র ১৩২৫। কলকাতা: প্রবাসী কার্য্যালয়। পৃ. ৫১৩। মুদ্রিত।
10) দেবী, শান্তা। 'পথের দেখা', ছুটি। কলকাতা: কমলা বুক ডিপো, ১৯৪৪। পৃ. ৮৮। মুদ্রিত।
11) দেবী, সীতা। "পূজার তত্ত্ব"। প্রবাসী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, পঞ্চবিংশ ভাগ-প্রথম খণ্ড, আষাঢ় ১৩৩২। কলকাতা: প্রবাসী কার্য্যালয়। পৃ. ৩৮০। মুদ্রিত।
12) দেবী, সীতা। "দেনা-পাওনা"। প্রবাসী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, ৩৮শ ভাগ-দ্বিতীয় খণ্ড, ফাল্গুন ১৩৪৫। কলকাতা: প্রবাসী কার্য্যালয়। পৃ. ৭২৮। মুদ্রিত।

13) বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। পুস্তক পরিচয়- "মহামায়া"। প্রবাসী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, ৩৫শ ভাগ-দ্বিতয় খণ্ড, মাঘ ১৩৪২। কলকাতা: প্রবাসী কার্য্যালয়। পৃ. ৫২৭। মুদ্রিত।
14) দেবী, শান্তা। "নারী-সমস্যা"। প্রবাসী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, ২৩শ ভাগ-দ্বিতীয় খণ্ড, পৌষ ১৩৩০। কলকাতা: প্রবাসী কার্য্যালয়। পৃ. ৪০৩। মুদ্রিত।
15) দেবী, শান্তা। "প্রাচীন ও নবীন সাহিত্য"। প্রবাসী, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, ৪৯শ ভাগ-দ্বিতীয় খণ্ড, ফাল্গুন ১৩৫৭। কলকাতা: প্রবাসী কার্য্যালয়। পৃ. ৪১৪। মুদ্রিত।
16) দেবী, শান্তা। "ভাষা ও সাহিত্য"। প্রবাসী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, ৩৩শ ভাগ-দ্বিতীয় খণ্ড, পৌষ ১৩৪০। কলকাতা: প্রবাসী কার্য্যালয়। পৃ. ৮১৯। মুদ্রিত।
17) দেবী, সীতা। "নারীর কাজ"। বঙ্গলক্ষ্মী, হেমলতা দেবী সম্পাদিত, ষষ্ঠ বর্ষ, ফাল্গুন ১৩৩৭। প্রকাশ স্থান ও প্রকাশ সংস্থা অনুল্লেখিত। পৃ. ২৪২। মুদ্রিত।
18) দেবী, সীতা। "দেশের কাজে বাংলার মেয়ে"। বঙ্গলক্ষ্মী, হেমলতা দেবী সম্পাদিত, ষষ্ঠ বর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৩৭। প্রকাশ স্থান ও প্রকাশ সংস্থা অনুল্লেখিত। পৃ. ৭১। মুদ্রিত।
19) দেবী, সীতা। "সাহিত্যের ভাষা ও বস্তু"। প্রবাসী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, ৩৪শ ভাগ-দ্বিতীয় খণ্ড, মাঘ ১৩৪১। কলকাতা: প্রবাসী কার্য্যালয়। পৃ. ৫১৯। মুদ্রিত।
20) সরকার, সুশোভন। সোশাল ফ্রেটারনিটি ও সীতা দেবী। *দেশ,* সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত ৪২ বর্ষ, ৩১ সংখ্যা, মে ১৯৭৫। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। পৃ. ৩৪১। মুদ্রিত।
21) তদেব।

গ্রন্থঋণ:

1) গুপ্ত, সুশীলকুমার। শান্তা দেবী ও সীতা দেবী। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৌষ ১৩৯২। মুদ্রিত।
2) ঘোষ, সুদক্ষিণা। মেয়েদের উপন্যাসে মেয়েদের কথা কাহাকে থেকে সুবর্ণলতা। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৮। মুদ্রিত।
3) ঘোষাল, ধনঞ্জয়। নবচেতনায় বঙ্গনারী। কলকাতা: আশাদীপ, ২০১৫। মুদ্রিত।
4) চন্দ, পুলক। নারীবিশ্ব। কলকাতা: গাঙচিল, ২০০৮। মুদ্রিত।
5) চৌধুরী, ভূদেব। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার। কলকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮২। মুদ্রিত।
6) দে, ড° মাধবী। শান্তা দেবী ও সীতা দেবী জীবন সাহিত্য আধুনিকতা। কলকাতা: সাহিত্যলোক, এপ্রিল ২০০৩। মুদ্রিত।
7) বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা। কলকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৪৫। মুদ্রিত।
8) ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন। বিংশ শতাব্দীর নারী ঔপন্যাসিক। কলকাতা: পূর্বা, ১৪০৮। মুদ্রিত।
9) ভট্টাচার্য, সুতপা। মেয়েদের লেখালেখি। কলকাতা: পুস্তক বিপনী, ২০০৪। মুদ্রিত।
10) ভট্টাচার্য, সুতপা। মেয়েলি পাঠ। কলকাতা: পুস্তক বিপনী, ২০০০। মুদ্রিত।
11) মৈত্র, জ্ঞানেশ। নারী জাগৃতি ও বাংলা সাহিত্য। কলকাতা: ন্যাশনাল পাবলিশার্স, ১৯৮৭। মুদ্রিত।